بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৪ জুলাই, ২০১৫ মোতাবেক ২৪ ওফা, ১৩৯৪ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

আমি এখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণিত কিছু ঘটনা শোনাব যা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এবং তাঁর সাহাবীদের সাথে সম্পর্ক রাখে।

'তাযকেরায়' ১৯০৮ইং সনের ৯ই ফেব্রুয়ারি তারিখের অধীনে একটি ইলহাম লেখা আছে। এই দিনে আটটি ইলহামের উল্লেখ রয়েছে যার একটি হলো, **"লা তাক্বতুলু যয়নাব"**। **(তাযকেরা, পৃ. ৬৩৫, ৪র্থ সংস্করণ, ২০০৪)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এক জায়গায় কিছু ঘটনার বর্ণনা করতে গিয়ে এই ইলহামের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, ১৯০৮ সালের প্রথম দিকে হাফেয আহমদুল্লাহ্ খান সাহেব মরহুমের দুই কন্যার বিয়ের প্রস্তাব আসে যাদের মাঝে বড় জনের নাম হল, যায়নাব আর ছোট জনের নাম ছিল কুলসুম। আরও অনেকেরই যয়নাবের সাথে সম্পর্কের বাসনা ছিল। (শেখ আব্দুর রহমান মিস্রীর পক্ষ থেকেও একটি প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল।) হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) মিস্রী সাহেবের সাথে তার বিয়ে দেয়া অপছন্দ করলেন (মিস্রী সাহেবের সাথে যেন তার বিয়ে না হয়), কিন্তু সাধারণত কোন বিষয়ে তিনি (আ.) যেভাবে জোর দিতেন সেভাবে জোর দেন নি বা বেশি চাপাচাপি করেন নি। সেই দিনগুলোতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি ইলহাম হয়, 'লা তাক্বতুলু যয়নাব' অর্থাৎ যয়নাবকে ধ্বংস করো না। হাফেয আহমদুল্লাহ্ মরহুম দ্বিতীয় ব্যক্তিকে কোন কারণে পছন্দ করেন নি আর ভেবেছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরামর্শ সঠিক নয়। দ্বিতীয় জায়গায় বিয়ে না দিয়ে মিস্রী সাহেবের কাছে বিয়ে দেয়া উচিত। আর ভেবেছেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দৃষ্টিভঙ্গিকে ইলহাম পত্যাখ্যান করেছে। [অর্থাৎ 'লা তাক্বতুলু যয়নাব' সংক্রান্ত ইলহামের অর্থ হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরামর্শ আল্লাহ্ তা'লার পছন্দ হয় নি, বরং দ্বিতীয় যে প্রস্তাব বা এর পাল্টা যে প্রস্তাব ছিল, তা সঠিক। যাহোক, তিনি মিস্রী সাহেবের কাছে মেয়ে বিয়ে দেন।] ১৯০৮ সনের ৯ ফেব্রুয়ারি এই ইলহাম হয় আর ১৯০৮ সনের ১৭ ফেব্রুয়ারি যয়নাবের সাথে মিস্রী সাহেবের বিয়ে হয়। [মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লিখেছেন যে,] এই তারিখ এভাবে সংরক্ষিত থাকে, মিস্রী সাহেবের বিয়ে আরো দুই বিয়ের সাথে সেই দিন হয়েছে, যে দিন আমাদের বোন মোবারেকা বেগমেরও বিয়ে হয়েছিল, আর এটি ছিল ১৭ ফেব্রুয়ারি ।

এক কথায় আল্লাহ্ তা'লা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা মানো আর মিস্‌রী সাহেবের কাছে বিয়ে দিবে না, নতুবা এই বিয়ে তাকে মুনাফিক হওয়ার কারণ হবে (বা তাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার কারণ হবে যা হত্যার নামান্তর)। কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হয়তো মনেই করেন নি যে, এই ইলহাম এই যয়নাব সংক্রান্ত আর মেয়ের পিতা উল্টো ফলাফল বের করেছে। অথচ এই ইলহামের পিছনে আল্লাহ্ তা'লার এটি প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল, এই ব্যক্তি থেকে এক ভারি ফিৎনার উদ্ভব হবে (পরবর্তীতে মিস্‌রী সাহেব থেকে এক নৈরাজ্যের সূচনা হয়) আর এর কাছে যয়নাবকে বিয়ে দিবে না আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা গ্রহণ কর। এছাড়া এই কথার প্রমাণও আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাফেয আহমদুল্লাহ্ সাহেবকে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন। মিস্‌রী সাহেব যখন জামা'ত থেকে পৃথক হয়ে যান [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে,] তখন পীর মঞ্জুর মুহাম্মদ সাহেব আমাকে একটি পয়গাম পাঠিয়েছেন যে, আমার সামনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) হাফেয আহমদুল্লাহ্ সাহেবকে বলেছিলেন, শেখ আব্দুর রহমানের কাছে মেয়ে বিয়ে দেয়া সমীচিন হবে না কিন্তু হাফেয সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা মানেন নি আর সেখানেই মেয়েকে বিয়ে দেন, তখন আমার মারাত্মকধরণের ক্ষোভ হয়। (পীর মঞ্জুর সাহেব এটি বর্ণনা করেছেন) আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সমীপে উপস্থিত হই আর বলি যে, হুযূর! আপনি খোদা তা'লার মা'মুর বা প্রত্যাদিষ্ট আর আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ হলো, যখন মা'মুর একটি কথা বলেন, তখন সব মু'মিনদের উচিত, সেটি মেনে চলা কিন্তু হাফেয আহমদুল্লাহ্ সাহেব হুযূরের অবাধ্যতা করেছেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখন বলেন, আপনি যে কথা বলেছেন, তা সঠিক, তবে এমন বিষয়ে আমি হস্তক্ষেপ করি না। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন] এই রেওয়ায়েত যখন আমার কর্ণগোচর হয়, যদিও এই বর্ণনায় আমার সন্দেহ থাকা সম্ভব ছিল না, কিন্তু এটি যেহেতু বিচ্ছিন্ন রেওয়ায়েত ছিল, তাই আমি ভাবলাম, অন্য কোন সাক্ষীও থাকা চাই। তার অর্থাৎ মিস্‌রী সাহেবের জামা'ত পরিত্যাগের যে পুরো পটভূমি ছিল আর এই যে নৈরাজ্য এই কারণে তিনি (রা.) বস্তুনিষ্ঠ কোন প্রমাণের সন্ধানে ছিলেন। যাহোক, তিনি (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার অপার লীলা যে, দ্বিতীয় দিন ডাক-যোগে একটি পত্র হস্তগত হয় যা মুন্সি কুদরতুল্লাহ্ সানোরী সাহেবের পক্ষ থেকে এসেছে। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে, ১৯১৫ সনে আমি যখন কাদিয়ান আসি, তখন কোন বন্ধুর কাছে কুরআন পড়ার প্রয়োজনিয়তা অনুভব হয়। আমি হাফেয আহমদুল্লাহ্ সাহেবের কাছে কুরআন করীম পাঠ করা আরম্ভ করি। একদিন কথায় কথায় তিনি আমাকে বলেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাকে অন্য কোন ব্যক্তির সাথে আমার মেয়ে যয়নাবের বিয়ের পরামর্শ দিয়েছিলেন। কিন্তু সেদিন গুলোতেই তাঁর প্রতি ইলহাম হয় যে, 'লা তাক্বতুলু যয়নাব' আমি ভুলবশতঃ এর এ অর্থ বুঝেছি যে, এর অর্থ হলো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মতামত সঠিক নয় আর এ কারণে আমি মিস্‌রী সাহেবের কাছে মেয়ে বিয়ে দেই। কিন্তু এখন শেখ মিস্‌রী আমাকে গভীর যাতনা দিচ্ছে। (একথা তার শ্বশুর বলছেন)

আর সে আমাকে অনেক বড় বড় কষ্ট দেয়া আরম্ভ করেছে। যার ফলে, আমি মনে করি, এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নির্দেশ না মানারই পরিণাম। অতএব [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] আমারও মনে আছে একবার হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর যুগে, শেখ মিস্‌রী সাহেব বাজারে নিজ শ্বশুরকে প্রহার করে, যার ফলে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.), মিস্‌রী সাহেবের প্রতি চরম অসন্তুষ্ট হন, আর বেশ কয়েকদিন ধরে তার কাছে আকুতি মিনতি করে আমি তাকে ক্ষমা করাই।

অতএব, এই ইলহামের অর্থ হলো তুমি শেখ মিস্‌রীর কাছে যয়নাবকে বিয়ে দেবে না, নতুবা তার ঈমানও নষ্ট হবে। অতএব, পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করেছে যে, এই বিয়ের ফলে তার ঈমানও ধ্বংস হয়েছে। **('মিসরি সাহেব কে খিলাফাত সে ইনহেরাফ কে মুতাল্লেক তাকরীর' আনওয়ারুল উলুম, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯-৫৮১)**

মিস্‌রী সাহেব সম্পর্কে অনেকেই হয়তো জানেন না যে, কে ছিল সে, তার কাহিনী কি? এটি ইতিহাসের একটি অধ্যায়। তাই এ সংক্রান্ত কিছুটা ব্যাখ্যা উপস্থাপন করছি। শেখ আব্দুর রহমান মিস্‌রী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছিলেন, যা উল্লেখ রয়েছে, তিনি শিক্ষিতও ছিলেন। এরপর তিনি মিশর যান আর তাকে মিশরে পাঠানোর ব্যয়ভারও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং চৌধুরী নাসরুল্লাহ্ খাঁন সাহেব বহন করেছেন। মিশর যাওয়া যেখানে তার জন্য অন্যান্য কল্যাণ বয়ে এনেছে সেখানে মিশর যাওয়া শেখ মিস্‌রী আখ্যায়িত হওয়ারও কারণ হয় আর এই কারণেই তাকে শেখ মিস্‌রী বলা হত। **('মিসরি সাহেব কে খিলাফাত সে ইনহেরাফ কে মুতাল্লেক তাকরীর' আনওয়ারুল উলুম, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৫৭৯)**

একটি সময় এমন আসে, যেভাবে আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর সাথে তিনি মতবিরোধ করেন, আর এই মতবিরোধের কারণে তাঁর বিরুদ্ধে তিনি অনেক অপলাপ আরম্ভ করে। জামাতে নৈরাজ্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। কিন্তু ব্যাপক পরিসরে যেখানে আল্লাহ্ তা'লা জামা'তকে নৈরাজ্য বা ফিতনা থেকে রক্ষা করেছেন, সেখানে কতক ব্যক্তিকে ব্যক্তিগতভাবেও তার অবস্থা সম্পর্কে স্বপ্নে জানিয়েছেন যে, এ ব্যক্তির স্বরূপ কেমন। জামাতে মিস্‌রী সাহেবের মর্যাদার কথা এটি থেকে ধারণা করুন যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজে বর্ণনা করেছেন যে, আফ্রিকা থেকে এক বন্ধু আমাকে পত্র লিখেছেন, মিস্‌রী সাহেবের জামা'ত ছেড়ে দেয়া নিয়ে আমি খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্থ। তিনি লিখেন, এত বড় বড় মানুষের ঈমান যেখানে নষ্ট হয়ে গেছে সেখানে আমাদের ঈমানের গুরুত্বই বা কী? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এর উত্তরে আমি তাকে লিখেছি, কে বড় এই সিদ্ধান্ত করা আল্লাহ্ তা'লার কাজ, আপনার নয়। আল্লাহ্ তা'লা যখন নিজ ব্যবহারিক আচরণের মাধ্যমে তাকে জামা'ত থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছেন, যাকে আপনি বড় মনে করতেন আর

আপনাকে জামাতে রেখেছেন, অতএব প্রমাণিত হলো, সে নয় বরং আপনিই বড়। **('মিসরি সাহেব কে খিলাফাত সে ইনহেরাফ কে মুতাল্লেক তাকরীর' আনওয়ারুল উলুম, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৫৬৪)**

যাহোক মিস্‌রী সাহেব যতদিন জামা'তভুক্ত ছিলেন, তাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হতো। আজ আমরা দেখছি যে, তিনি অর্থহীন। এই মতবিরোধের যুগে বা জামা'ত থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর মিস্‌রী সাহেব নিজেই 'লা তাকতুলূ যয়নাবা' সংক্রান্ত ইলহাম বলে নিজের গুরুত্ব প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি এইভাবে ইলহাম হয়েছে আর এটি আমার সম্পর্কে ছিল। তবে বাকি ইলহামের সমান্তরালে রেখে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) যখন এই ইলহামের স্বরূপ তুলে ধরেন আর জামাতের সদস্যরাও তা বর্ণনা করা আরম্ভ করে, তখন মিস্‌রী সাহেব বলেন, আমার স্ত্রী যয়নাবকে কেন এই বিষয়ে টানাহেঁচড়া করা হচ্ছে। এই ইলহামের ব্যাখ্যা তুলে ধরার কারণ এটিই, যা হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) স্পষ্ট করেছেন যে, এই ইলহাম কীভাবে পূর্ণ হয়েছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) আরও বলেন, দেখ, এটি কত অসাধারণ ভবিষ্যদ্বাণী যার প্রতি স্বয়ং মিস্‌রী সাহেব মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। মনে হয়, তার স্ত্রীর স্মরণ ছিল যে, এমন ইলহাম হয়েছে। (তার স্ত্রী বলেন যে,) আমার পিতা বুঝতে পেরেছিলেন যে, এটি আমার সম্পর্কে ছিল। [(হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন)] এভাবে তার (মিস্‌রী সাহেবেরও) দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ হয় আর হয়তো যে কাজ আমাদের দ্বারা অনেক বিলম্বে হতো, সেই কাজ তিনি নিজেই করে দিয়েছেন।

[হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) সেই দৃষ্টান্ত দিতেন] ঠিক সেভাবেই যেভাবে ছাগল ছুরি বের করেছিল। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ছিল যে ছাগল জবাই করার জন্য ছুরি বের করে। কিন্তু এরপর সে ভুলে যায় যে, ছুরি কোথায় রেখেছে। বাচ্চারা খেলতে খেলতে সেই ছুরি মাটি দ্বারা ঢেকে ফেলে এবং তা মাটির নিচে চাপা পড়ে যায়। সেই ব্যক্তি ছুরির অনেক সন্ধান করে কিন্তু পায় নি। সে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, হঠাৎ করে ছাগল ভূমিতে পা দিয়ে আঘাত করতে আরম্ভ করে। এর ফলে যা হয়েছে তা হল, মাটি সরে যায় আর সেই ছুরি তার চোখে পড়ে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সে ছুরি চালিয়ে সেই ছাগল জবাই করে। তখন থেকে আরবে এই প্রবাদ প্রচলন লাভ করে যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজ হাতে নিজ ধ্বংসের ডেকে আনে তাকে বলা হয় যে, সে অবিকল তাই করেছে যেভাবে ছাগল মাটি খুঁড়ে ছুরি বের করেছিল। **('মিসরি সাহেব কে খিলাফাত সে ইনহেরাফ কে মুতাল্লেক তাকরীর' আনওয়ারুল উলুম, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ৫৮১)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এই উপসংহারও টেনেছেন আর এই দৃষ্টান্ত অত্যন্ত স্পষ্টভাবে প্রকাশ হয় যে, হাফেয সাহেব যদি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা মেনে নিজের কন্যাকে মিস্‌রী সাহেবের কাছে বিয়ে না দিতেন তাহলে তার ঈমান নষ্ট হতো না। **অতএব প্রত্যাদিষ্টদের কথা মেনে চলা মু'মিনদের জন্য আবশ্যক**। আর তা অনুধাবন করা উচিত এবং নিজেদের মত ব্যাখ্যা না করে আক্ষরিকভাবে যদি তা মেনে চলা হয়, তাহলে ঈমান নষ্ট হয় না বা ধ্বংস হয় না।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) অপর একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেবের স্বভাব ছিল বড় ত্বরাপরায়ণ। একবার হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) ভ্রমণের জন্য বাসরাওয়ার দিকে যান। পথিমধ্যে তিনি (ভ্রমণকালে) বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কালাম বা কথা এবং বান্দার কথার মাঝে অনেক পার্থক্য থেকে থাকে। তিনি (আ.) তাঁর একটি ইলহাম শুনান এবং বলেন যে, দেখ, এটিও একটি ইলহাম, পক্ষান্তরে হারীরির এ সম্পর্কে উক্তিও রয়েছে, (হারীরি একজন লেখক ছিলেন)। মৌলভী মুহাম্মদ আহসান সাহেব কথার শেষ অংশ মনোযোগ সহকারে শুনেন নি আর ইলহাম সম্পর্কে ধরে নেন যে, এটি হারীরির উক্তি। তিনি বলেন, এটি একেবারেই বাজে কথা। তবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বলেন, এটি তো খোদা তা'লার ইলহাম বা উক্তি, তখন তাৎক্ষণিকভাবে মৌলভী সাহেব বলেন, সুবহানাল্লাহ্! কত উন্নত মানের উক্তি। **(আল্ ফযল, ৩০ মে ১৯৫৯, পৃঃ ৪, সংখ্যা ১২৭, খণ্ড ৪৮/১৩)**

অতএব কোন কথা সম্পর্কে কোন মতামত প্রকাশ করতে গিয়ে তড়িঘড়ি বা তাড়াহুড়া করে কিছু বলা উচিত নয়।

আজকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে বরং সব দেশে পরিচিত, এই কথা বলতে গিয়ে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যে, আমার কাছে, এক শিখ আসে এবং বলতে থাকে যে, আপনার জ্যাঠা মির্যা গোলাম কাদের সাহেব অনেক খ্যাতি রাখতেন এবং অনেক বড় পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব ছিলেন অপরিচিত। তাঁকে কেউ জানতো না। সেই শিখ আরো বলা আরম্ভ করে যে, আমার পিতা একবার মির্যা গোলাম মুর্তজা সাহেবের কাছে যান (অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মওউদ আ.-এর পিতার কাছে) আর বলেন, আমি শুনেছি আপনার আরও এক সন্তান আছে, তিনি কোথায়? তাঁর পিতা বলেন, সে তো সারাদিন মসজিদেই পড়ে থাকে আর কুরআন পড়ায় রত থাকে। আমি তার জন্য খুবই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত যে, কোথা থেকে তাঁর রিযিকের ব্যবস্থা হবে। তুমি তাঁর কাছে যাও এবং তাকে বল, দুনিয়ার কথাও যেন কিছুটা ভাবে। আমি চাই সে যেন কোন চাকরি করে কিন্তু আমি যখনই তাঁর জন্য চাকুরির ব্যবস্থা করি, সে তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। সুতরাং আমার পিতা তাঁর কাছে যান (অর্থাৎ সেই শিখের পিতা) এবং বড় মির্যা সাহেবের কথা তাঁকে পৌঁছান। এতে তিনি বলতে লাগলেন, [হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,] আমার পিতা অনর্থক চিন্তা করেন। এই বস্তু জগতের চাকরি দিয়ে আমি কী করব। আপনি তাঁর কাছে যান (আমার পিতার কাছে) এবং তাকে বলুন যে, আমার যার চাকরি নেয়ার ছিল, তা আমি নিয়ে নিয়েছি, মানুষের চাকরির আমার কোন প্রয়োজন নেই। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] সেই শিখের ওপর এই কথার এতই গভীর প্রভাব ছিল যে, যখনই তিনি তাঁর কথা বলতেন তার চোখ গড়িয়ে অশ্রু পড়তো।

[হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন যে,] একবার ছোট মসজিদে সেই ব্যক্তি আমার কাছে আসে এবং অঝোরে কাঁদতে আরম্ভ করে। আমি বললাম, কি ব্যাপার? সে তখন বলতে লাগল যে,

আজ আমার ওপর অনেক বড় যুলুম হয়েছে। আজকে আমি বেহেশতী মাক্বেরায় গিয়েছিলাম। আমি যখন মির্যা সাহেবের কবরে সিজদা করতে যাচ্ছিলাম তখন এক আহমদী আমাকে বারণ করে অথচ আহমদীর ধর্ম ভিন্ন আর আমার ধর্ম ভিন্ন। আহমদীরা কবরে সিজদা করে না, তো তারা না করুক, আমি তো শিখ, আমরা সিজদা করি। প্রশ্ন হলো এক আহমদী আমাকে কেন বাধা দিল? অতঃপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এক কথায় তিনি [হযরত মসীহ মওউদ (আ.)] সম্পূর্ণভাবে নির্জনতা প্রিয় ছিলেন আর যারা তাঁর পরিচিত ছিল, তাদের ওপর তাঁর ইবাদত এবং দুনিয়া বিমুখতার এত গভীর প্রভাব ছিল যে, অমুসলিম হওয়া সত্ত্বেও তাঁর (আ.) ইন্তেকালের পরও তারা তাঁর মাজারে আসত। **(আল্ ফযল, ৩০ মে, ১৯৫৯, পৃ: ৪, সংখ্যা ১২৭, খণ্ড: ৪৮/১৩)**

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাহেব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বন্ধু ছিলেন। তাঁর (আ.) দাবির পর সে বলে যে, আমি এই ব্যক্তিকে উপরে উঠিয়েছি এখন আমিই তাঁর অধঃপতন আনব। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তার নামকে (মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন) মিটিয়ে দিয়েছেন আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামকে সারা পৃথিবীতে সমুন্নত করেছেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেবের এক পুত্র আর্য ধর্ম গ্রহণ করে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমি তাকে কাদিয়ানে আসতে বলি এবং **পুনরায় তাকে ইসলাম ধর্মে ফিরিয়ে এনেছি। মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন সাহেব এ কারণে আমাকে কৃতজ্ঞতামূলক পত্রও লিখেছেন।**

অতঃপর, দ্বিতীয় খিলাফত কালে অভ্যন্তরীন এবং বাহিরের বিরোধিতার কথা উল্লেখ করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগ থেকে বিরোধিতা চলে আসছে কিন্তু তাসত্ত্বেও জামা'ত ক্রমাগতভাবে উন্নতি করে চলেছে। বরং আজও আমরা দেখছি যে, বিভিন্ন ষড়যন্ত্র এবং বিরোধিতার ধারা অব্যাহত আছে, তথাপি খোদার অপার কৃপায় জামা'ত উন্নতি করে চলছে। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, জামা'ত কন্টকাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে বর্তমান মর্যাদায় উপনীত হয়েছে আর এটি থেকে স্পষ্ট হয় যে, খোদার কৃপা সবসময় জামাতের সাথে ছিল। কিন্তু এই কৃপারাজিকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য জামাতের সবসময় দোয়ায় রত থাকা উচিত। **(আল্ ফযল, ৩০ মে, ১৯৫৯, পৃ: ৪, সংখ্যা ১২৭, খণ্ড ৪৮/১৩)**

যদি সত্যিকার অর্থে, আমরা দোয়া করতে থাকি তাহলে ইনশাআল্লাহ্ বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ সকল **বিরোধিতার অপমৃত্যু ঘটবে।**

একবার, হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-এর অতুলনীয় ত্যাগের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর জন্য আল্লাহ্ তা'লা এক উন্নত চাকরির ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সেই ছুটি (শেষ হতেই) তিনি পৈতৃক অঞ্চলে ডাক্তারি প্র্যাকটিস আরম্ভ করেন। সেখানে তার অনেক খ্যাতি ছিল। তার পৈতৃক এলাকা হলো

সারগোদার ভেরা। এখানে অনেক বড়-বড় জমিদার রয়েছে, যাদের বেশীর ভাগ ছিল তাঁর ভক্ত। সেখানে তার হেকীমি পেশায় সফলতার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের জন্য কাদিয়ান আসেন। কয়েকদিন পর, যখন ফিরে যাওয়ার ইচ্ছা করেন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাকে বলেন, এই বস্তু জগতের আপনি অনেক কিছু দেখেছেন, এখন এখানেই বসতি স্থাপন করুন।

তিনি এই নির্দেশ এমনভাবে শিরোধার্য করেন যে, পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম আনার জন্যও নিজে যান নি বরং দ্বিতীয় কোন ব্যক্তিকে পাঠিয়ে তা আনিয়ে নেন। সেই যুগে, এখানে তার পেশা সফল হওয়ার কোন আশাই ছিল না, বরং এখানে এক পয়সা দেয়ার মতো সামর্থবানও কেউ ছিল না কিন্তু তিনি কোন কথার ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

তারপরও, তার খ্যাতি এমন ছিল যে, বাহির থেকে রোগীরা তার কাছে পৌঁছে যেত আর এভাবে আয় উপার্জনের কোন না কোন পথ খুলে যেত। কিন্তু হযরত মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-এর কুরবানী এমন পর্যায়ের ছিল যে, আয় উপার্জনেরও কোন সম্ভাবনা ছিল না, কোন দিক থেকে ফিস আসারও কোন সম্ভাবনা ছিল না, আর বেতনও ছিল না এবং বৃত্তিও না। কোন দিক থেকেই আয়ের কোন উৎস ছিল না। কিন্তু তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সেক্রেটারী হিসেবে কাজ করতেন। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন] এখন সকল বিভাগ অর্থাৎ জামা'তী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে যত কাজ করছে, এই সব কাজ তিনি একা করতেন, অথচ তাঁর জীবন জীবিকারও কোন উপায় ছিল না। আর এ ব্যাপারটি তৃণলতাহীন মরুপ্রান্তরে জীবন উৎস্বর্গ করার মতোই ছিল। (খুতবাতে মাহমুদ, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৬০-২৬১)

সুতরাং এই হলো আমাদের প্রবীণদের আদর্শ যা আমাদের ওয়াকফে জিন্দেগীদেরকে বিভিন্ন সময় সামনে রেখে নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে ভাবা উচিত। এরপর, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-এর যে ভালোবাসা ছিল, সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি মৌলভী আব্দুল করীম সাহেবের বিশেষ প্রেম এবং ভালোবাসা ছিল আর তা এমন ভালোবাসা ছিল যে, এটি কেবল তারাই অনুধাবন করতে পারে যারা সেই যুগ দেখেছে। অন্যরা তা ধারণাও করতে পারবে না। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] তিনি এমন এক সময় ইন্তেকাল করেন যখন আমার বয়স ছিল ষোল বা সতেরো। আর যে যুগে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জন্য তার ভালোবাসা আমি বুঝতে পেরেছি তখন আমার বয়স হবে বারো বা তেরো বছর; অর্থাৎ অনেকটা শৈশবকাল ছিল। কিন্তু তাসত্ত্বেও এটি আমার হৃদয়ে এমনভাবে গ্রথিত রয়েছে যে, মৌলভী সাহেবের দু'টো জিনিস আমি কখনও ভুলতে পারবো না। একটি হলো, তার পানি পান করা আর অপরটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি তার গভীর ভালোবাসা। তিনি ঠান্ডা পানি খুবই পছন্দ করতেন আর তা আগ্রহভরে পান করতেন আর পান করার সময় তার গলা থেকে

এমন শব্দ বের হতো যেন আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামতকে একত্রিত করে পাঠিয়ে দিয়েছেন। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ১২১-১২২)**

বারে বারে কয়েক ঢোক করে পান করার পর আলহামদুলিল্লাহ্, আলহামদুলিল্লাহ্ বলতে থাকতেন। **(খুতবাতে মাহমুদ, ২৪তম খণ্ড, পৃঃ ১৫৮)**

[হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] সেই যুগে এই মসজিদে আক্বসার কূপের পানির বড় খ্যাতি ছিল। এখন জানা নেই যে, মানুষ কেন এর নাম নেয় না। তার রীতি ছিল, তিনি বলতেন যে, ভাই কেউ পুণ্যার্জন করো আর পানি নিয়ে আস। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন বৈঠকে নিজে উপস্থিত থাকতেন তখনকার কথা ভিন্ন, নতুবা তিনি সিড়িতে এসে দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় থাকতেন আর পানি নিয়ে যে-ই আসত তার কাছ থেকে গ্লাসে পানি নিয়ে পান করা আরম্ভ করতেন। দ্বিতীয় কথা হলো, তিনি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাহচর্যে যখন বসে থাকতেন তখন এমন মনে হতো যে, তার চোখ হুযূরের পবিত্র দেহ থেকে কিছু নিয়ে ভক্ষণ করছে। তখন তাঁর পবিত্র চেহারায় প্রস্ফুটিত ফুলের এক বাগানে হাস্যোৎফুল্লতা তরাঙ্গায়িত হচ্ছে বলে মনে হতো। তাঁর চেহারার প্রতিটি বিন্দুতে আনন্দের ঢেউ খেলে যেত। তিনি যেভাবে হাসি-মুখে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কথা শুনতেন আর বার বার পার্শ্ব পরিবর্তন করে যেভাবে সাধুবাদ জানাতেন, তা এক দর্শনীয় দৃশ্যের অবতারনা করত। এর ন্যূনতম চিত্র যদি আমি অন্য কারও মাঝে দেখে থাকি, তাহলে তা ছিল হযরত হাফেয রওশন আলী সাহেব মরহুমের মাঝে। এক কথায় মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুমের, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি বিশেষ প্রেম এবং ভালোবাসা ছিল। আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এরও তার প্রতি একই ধরণের ভালোবাসা ছিল। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর রীতি এই ছিল যে, তিনি সবসময় মাগরিবের নামাযের পর বসে আলাপচারিতায় রত হতেন। কিন্তু মৌলভী সাহেবের তিরোধানের পর তিনি এমনটি করা বন্ধ করে দেন। কেউ নিবেদন করে যে, হুযূর! আপনি এখন আর বসেন না? তিনি (আ.) বলেন, মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.)-এর জায়গা খালি দেখে আমার কষ্ট হয়। অথচ কে আছে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর চেয়ে বেশী আল্লাহ্ তা'লাকে 'হাইউন' এবং পুনর্জীবনদাতা হিসেবে বিশ্বাস করত। তাই, এটি এক তরফা ভালোবাসা ছিল না। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৪তম খণ্ড, পৃঃ ১২২)**

তিনি (আ.) তাঁর সাহাবীদের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) একটি ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, আমার মনে আছে, কাদিয়ানে একবার এক ব্যক্তি মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম (রা.) সম্পর্কে কিছু অশোভনীয় কথা বলে। মানুষ তাকে ধরে মারতে শুরু করে। সেই ব্যক্তিও ছিল নাছোড় বান্দা। মানুষ তাকে ক্রমাগতভাবে মারতে থাকে আর সে বলতে থাকে যে, আমি তো এটিই বলবো। মানুষ পুনরায় তাকে মারতে থাকে আর এই বিতণ্ডা এভাবে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন,] তখন আমাদের বয়স কম ছিল। এটি

আমাদের জন্য এক তামাশায় রূপ নেয়। সে মার খেয়ে যাচ্ছে অপর দিকে বলছে যে, আমি তো এটিই বলবো। মানুষ তাকে আরও মারতে থাকে, এমনকি মারতে মারতে তারা ক্লান্ত হয়ে যায়। সেই দিনগুলোতে এক অ-আহমদী পাহলোয়ান (কুস্তিগীর) হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর কাছে চিকিৎসার জন্য আসে। [এটি খিলাফতের পূর্বের কথা বা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যুগের কথা।] এই হট্টগোল যখন তার কর্ণগোচর হয় (তখন সে ভাবে যে, এটি হয়তো কোন পুণ্যের কাজ।), সে ভাবলো আমি কেন এই পুণ্য থেকে বঞ্চিত থাকব। আমারও এতে অংশ নেয়া উচিত। তাই সেও সেখানে যায় অথচ তার জানাও ছিল না যে, ব্যাপার কি? সে তাকে ওপরে উঠায় আর লাটিমের মতো ঘুরিয়ে মাটিতে ফেলে দেয়। কিন্তু সেই ব্যক্তিও ছিল চরম নাছোড় বান্দা। পুনরায় সে বলে যে, আমি তো এটিই বলতে থাকব। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমাদের জন্য এটি তামাশা স্বরূপ ছিল।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যখন এটি জানতে পারেন, তখন তিনি খুবই অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন যে, এটিই কি আমাদের শিক্ষা? তিনি বলেন, দেখ, মানুষ আমাদেরকে গালি দেয় কিন্তু এতে আমাদের কী ক্ষতি! সে যদি কিছু অশোভনীয় শব্দ মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) সম্পর্কে বলে থাকে তাহলে এতে হয়েছে কী? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, অন্যদের কথা বাদই দিলাম আমাদের নানাজান মীর নাসের নবাব সাহেব (রা.), যখন এটি দেখেন তখন তিনি সেখানে যান এবং মানুষকে বলেন, তোমরা এটি কেমন বাজে কাজ শুরু করেছ, কেন তোমরা এই ব্যক্তিকে মারছো? এই নসীহত করা তখনও তার শেষ হয় নি কিন্তু এরই মাঝে সেই ব্যক্তি মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) সম্পর্কে একই শব্দের পুনরাবৃত্তি করে। তখন মীর সাহেব নিজেও তাকে দু'চারটি থাপ্পড় লাগিয়ে দেয়। [হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা) বলেন,] প্রায় সময় মানুষ এমন কাজও করে বসে, যা বাজে কাজ। সত্যিকার অর্থে মানুষ প্রবহমান স্রোতধারার অপেক্ষায় থাকে, প্রবাহিত স্রোত দেখলে মানুষ তাতে গা ভাসিয়ে দেয়। **(আল্ ফযল, ৫ জুন, ১৯৪৮, পৃ. ৬, সংখ্যা ১২৭, ২য় খণ্ড)**

কিন্তু তা সত্ত্বেও, নিজেদের আবেগ অনুভূতির ওপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ রাখা চাই। অতঃপর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর অপর এক সাহাবী হযরত মুনসী আরোড়া খান সাহেব (রা.)-এর তাঁর (আ.) প্রতি ভালোবাসার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "মুনসী আরোড়া খান সাহেব-এর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল। তিনি কপুরথলায় থাকতেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কপুরথলা জামাতের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার এত ভূয়সী প্রশংসা করতেন যে, তিনি তাদেরকে লিখিত এক সন্তুষ্টিনামা দিয়ে ধন্যও করেছেন যা তারা (অর্থাৎ জামা'ত) সংরক্ষিত রেখেছে। তিনি (আ.) এতে লিখেন, এই জামা'ত এমন আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছে যে, জান্নাতে তারা আমার সাথী হবে।

তারা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে বারবার অনুরোধ করে যে, হুযূর! কোন সময় কপুরথলা তশরীফ নিয়ে আসুন। তিনি (আ.)ও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, সুযোগ পেলে আসব। একবার সুযোগ আসলে তাদেরকে আগাম সংবাদ দেয়ার মতো সময় হাতে ছিল না। তাই, কোন সংবাদ না জানিয়েই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যাত্রা করেন আর কপুরথলা স্টেশনে যখন নামেন তখন এক ভয়াবহ বিরোধীর তাঁর (আ.) ওপর চোখ পড়ে, যে তাঁকে চিনত। যদিও সে বিরোধী ছিল কিন্তু মহান লোকদের একটা গভীর প্রভাব থেকে থাকে। মুনসী আরোরা খান সাহেব বলেন যে, আমরা কোন একটা দোকানে বসে কথা বলছিলাম। সে ছুটে আসে আর বলে যে, তোমাদের মির্যা সাহেব এসেছেন। এ কথা শুনামাত্রই আমি খালি পায়ে এবং খালি মাথায় স্টেশনের দিকে ছুটতে থাকি আর জুতা এবং পাগড়ী সেখানেই পড়ে থাকে। কিছুদূর গিয়ে আমার মনে হলো যে, আমাদের কোথায় এমন সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এখানে আসবেন। সংবাদদাতা বিরোধী, সে কৌতুক-তামাশা করে থাকবে। তখন আমি দাঁড়িয়ে যাই আর তাকে বকা-ঝকা আরম্ভ করি।

মুনসী সাহেব বলেন, আমি তাকে বকা-ঝকা করি যে, তুমি মিথ্যা বলছ, ঠাট্টা করছ। কিন্তু এরপর আবার ভাবলাম যে, হয়তো এসেই গিয়ে থাকবেন। আমি আবারও ছুটতে আরম্ভ করি। এরপর আবার ভাবলাম যে, এত সৌভাগ্য আমাদের হবে না এবং পুনরায় তাকে বকা-ঝকা আরম্ভ করি। সে বলে যে, আমাকে বকা-ঝকা করো না, আমি তোমার সাথে যাচ্ছি। সে আমার সাথে যাত্রা করে। এক কথায়, আমি একবার দৌড়াই তো আর একবার দাঁড়াই। এভাবে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ সামনে দেখি যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর শুভাগমন হচ্ছে। সুতরাং এটি হলো উন্মাদের ভালোবাসা আর তার নিজ প্রেমাস্পদের সুভাগমণের কথা মনে পড়লেই হৃদয় বলতো যে, তিনি কিভাবে আমাদের কাছে আসতে পারেন! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইন্তেকালের স্বল্পকাল পর মুনসী আরোড়া খান সাহেব (রা.) কাদিয়ান এসে যান। একবার, তিনি আমাকে সংবাদ পাঠান যে, আমি দেখা করতে চাই।

আমি যখন তার সাথে দেখা করার জন্য বাহিরে আসলাম তখন দেখলাম যে, তার হাতে দু'টি বা তিনটি আশরাফী রয়েছে, যা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে তিনি বলেন, হযরত আম্মাজানকে দেবেন। আমার মনে নেই যে, তখন তিনি কি বলেছেন, কিন্তু আম্মাজান বা আম্মাজী অর্থাৎ মা অর্থবোধক কোন শব্দ তিনি বলেন। এরপর তিনি অঝোরে কান্না আরম্ভ করেন আর উচ্চ স্বরে এমনভাবে কাঁদতে থাকেন যে, তার পুরো শরীর কাঁপছিল। যদিও আমার ধারণা ছিল যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর স্মৃতি তাকে কাঁদাচ্ছিল। কিন্তু তিনি এতটা অনিয়ন্ত্রিতভাবে কাঁদছিলেন যে, আমার মনে হলো, অন্য কোন কারণও থাকতে পারে।

এক কথায় দীর্ঘক্ষণ বরং ১৫/২০ মিনিট অথবা প্রায় আধা ঘন্টা ধরে তিনি কাঁদতে থাকেন। আমি জিজ্ঞেস করতে থাকি যে, ব্যাপার কী? তিনি উত্তর দিতে চাইতেন কিন্তু আবেগের আতিশয্যে উত্তর দেয়া সম্ভব ছিল না। কিছুটা নিয়ন্ত্রণ ফিরে পাওয়ার পর তিনি বলেন, আমি যখন বয়আত করেছি,

তখন আমার বেতন ছিল সাত রুপিয়া। আর সকলভাবে ব্যয় সংকোচন করে কিছু না কিছু পয়সা সাশ্রয় করতাম, যেন স্বয়ং কাদিয়ান গিয়ে হুযূরের সকাশে পেশ করতে পারি । রাস্তার একটা বড় অংশ পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতাম যেন ন্যূনতম খরচ করে কাদিয়ান পৌঁছতে পারি। এরপর আমার পদোন্নতি হয় আর একই সাথে দেয়ার এই লিপ্সাও ক্রমশ বাড়তে থাকে।

অবশেষে আমার হৃদয়ে হুযূর-সমীপে স্বর্ণ উপহার দেয়ার বাসনা জাগে। যা সামান্য বেতন থেকে চাঁদা দেয়ার পর আমি অতিরিক্ত দেয়ার বাসনা রাখতাম। কিন্তু অল্প অল্প করে কিছু জমা করার পর ব্যতিব্যস্ত হয়ে যেতাম যে, মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে দেখেছি অনেক দিন হয়ে গেছে ,তাই স্বর্ণ হস্তগত করার জন্য পর্যাপ্ত টাকা জমা হওয়ার পূর্বেই কাদিয়ান চলে আসতাম, আর কাছে যা থাকত, হুযূরের সমীপে নিবেদন করতাম। অবশেষে এই তিন আশরাফী একত্রিত করেছিলাম, ইচ্ছা ছিল যে, স্বয়ং উপস্থিত হয়ে হুযূরের সকাশে নিবেদন করব কিন্তু এরই মাঝে হুযূর ইহধাম ত্যাগ করেন। এক কথায়, তার ত্রিশটি বছর এই আক্ষেপের মাঝে কেটে যায়। এর জন্য পরিশ্রমও করেছেন কিন্তু তৌফিক যখন হয়েছে, ততদিনে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইহজীবনের সমাপ্তি ঘটে। **(খুতবাতে মাহমুদ, ১৪তম খণ্ড, পৃ. ১৭৮-১৮০)**

এই তো ছিল তাদের নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতা আর ত্যাগের প্রেরণা। আরবী ভাষার কিছু অক্ষর এমন রয়েছে যা বিশেষভাবে উচ্চারণ করতে হয় আর অনারবরা তা সঠিকভাবে উচ্চারণ করতে পারে না। একবার এক আরব আলোচনাকালে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে এই আপত্তি করে যে, আপনি সঠিক উচ্চারণ করতে পারেন না। এই ঘটনার উল্লেখ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বৈঠকে একবার এক ব্যক্তি আসে। তিনি (আ.) তাকে তবলীগ করা আরম্ভ করেন এবং কথায় কথায় বলেন যে, কুরআনে এইভাবে বলা হয়েছে। পাঞ্জাবী ভাষায় যেহেতু 'কাফ' এবং 'ক্বাফ' সঠিকভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব নয়, সচরাচর মানুষ কুরআন বলতে গিয়ে ক্বারীদের ন্যায় 'ক্বাফ' এর উচ্চারণ গলা থেকে করে না বরং সেটি এমন ধ্বনি হয়ে থাকে যা 'ক্বাফ' এবং 'কাফ' এর মধ্যবর্তী ধ্বনি দিয়ে থাকে।

তিনি (আ.)ও তখন কুরআন শব্দ সাধারণভাবেই উচ্চারণ করেন। তখন সেই ব্যক্তি বলা আরম্ভ করে যে, বড় নবী সাজেন, কুরআন শব্দ উচ্চারণ করতে পারেন না। আপনি এর তফসীর কি করবেন। সেই বৈঠকে, হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ (রা.) উপস্থিত ছিলেন, এ কথা বলতেই তিনি তাকে থাপ্পড় মারার জন্য হাত উপরে তুলেন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তখনই তার হাত ধরে ফেলেন। অপর দিকে মৌলভী আব্দুল করীম মরহুমও উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি দ্বিতীয় হাত ধরে ফেলেন। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) পুনরায় তাকে তবলীগ আরম্ভ করেন। এরপর হযরত সাহেবযাদা আব্দুল লতীফ সাহেবকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এভাবে সম্বোধন করেন যে, এদের কাছে এই অস্ত্রই আছে। এই অস্ত্রও যদি তারা ব্যবহার না করে তাহলে বলুন, তারা আর করবে কী? আপনি যদি এই

আশা রাখেন যে, এরাও যুক্তি প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলবে আর তাদের মুখ থেকে সত্য নিঃসৃত হবে তাহলে আল্লাহ্ তা'লার আমাকে প্রেরণের প্রয়োজন কী ছিল? আমাকে তাঁর প্রেরণ করাই বলছে (অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লার আমাকে প্রেরণ করাই বলছে যে,) এদের কাছে সত্য অবশিষ্ট নেই। তাদের কাছে এই অস্ত্রই আছে আর [সাহেবযাদা সাহেবকে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,] আপনি চান যে, তারা এই অস্ত্রও ব্যবহার না করুক। **(আল্ ফযল, ৯ মার্চ ১৯৩৮, পৃঃ ৭, সংখ্যা ৫৫, ২৬ খণ্ড)**

এক জায়গায় 'দোয়াদ' শব্দের উচ্চারণের উল্লেখও রয়েছে আর এটিও হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন। হয়তো একই সময় 'ক্বাফ' এবং 'দোয়াদ' উভয় অক্ষরের উচ্চারণ নিয়ে সেই ব্যক্তি কটাক্ষ করে থাকবে, উভয় জায়গায় একই ধরণের রেওয়ায়েত দেখা যায়।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) নিজেই 'দোয়াদ' সংক্রান্ত ঘটনা লিখতে গিয়ে বলেন, আরবরা বলে 'দোয়াদ' আমাদের মতো কেউ উচ্চারণ করতে পারে না, তাই আপত্তি করার কি হেতু আছে? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, পাঞ্জাবীদের মাঝে 'দোয়াদ' সবচেয়ে নিকটবর্তী উচ্চারণ হয়তো আমি করে থাকি কিন্তু আমার উচ্চারণও হয়তো সঠিক হয় না। **(আল্ ফযল, ১১ অক্টোবর ১৯৬১, পৃ. ৩, সংখ্যা ২৩৫, খণ্ড ৫০/১৫)**

অতএব আমি স্পষ্ট করে দিলাম যে, এই উভয় অক্ষরের উভয়ের অর্থাৎ 'ক্বাফ' এবং 'দোয়াদ' উভয় অক্ষরসংক্রান্ত ঘটনা পাওয়া যায় আর সাধারণভাবে 'দোয়াদ'-এর ঘটনা হয়তো জামাতে অধিক পরিচিত। তাই মানুষ হয়তো আমাকে লেখা আরম্ভ করবে যে, এটি 'ক্বাফ' এর ঘটনা নয় বরং 'দোয়াদ' সংক্রান্ত ঘটনা। একারণে আমি এটি স্পষ্ট করে দিলাম। কেননা, বিনা কারণে ডাক বা চিঠির বহর বেড়ে যাবে আর ডাকের কাজ যারা করে সেই টীম সমস্যায় পড়বে ।

এরপর হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) ধৈর্য্যের কথা বলতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ধৈর্য্যের মান কেমন ছিল তা উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর নামে আহমদীয়াতের শত্রুদের এমন এমন কদর্যতায় পূর্ণ পত্র আমি পড়েছি যা পড়ে শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়।

তথাপি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) সেইসব পত্র সংরক্ষিত রেখেছেন এবং ধৈর্য্য প্রদর্শন করেছেন। তিনি বলেন, এমনসব পত্র এত অজস্র ধারায় তাঁর কাছে পৌঁছাত যে, আমি মনে করি এত অজস্র ধারায় পত্র আমার কাছেও আসে না। আমার কাছে বছরে হয়তো চার পাঁচটি এমন নোংরা পত্র আসে। অবশ্য সেই সব পত্রের কথা বাদ দিয়ে বলছি যা বিয়ারিং হয়ে থাকে যা ফেরত দিয়ে দেয়া হয় কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে প্রত্যেক সপ্তাহে দু'তিনটি এমন পত্র অবশ্যই আসত আর তা এমন নোংরা এবং বাজে গালিতে ভরা থাকত যে, মানুষ দেখে আশ্চর্য হতো।

তিনি বলেন, দৈবক্রমে আমি একবার এসব পত্র পড়া আরম্ভ করি। দু'একটি পত্র পড়তেই আমার শরীরের রক্ত গরম হয়ে যায়। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তা দেখে তাৎক্ষণিকভাবে এসে

পত্রের সেই থলি আমার হাত থেকে নিয়ে যান এবং বলেন, এগুলো পড়তে যেয়ো না। এমনসব পত্রের বহু থলি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর কাছে রাখা ছিল। লাকড়ির একটি বাক্সে এসব পত্র তিনি সংরক্ষণ করতেন। বেশ কয়েকবার এমন পত্র তিনি জ্বালিয়েছেনও, কিন্তু আবার অনেক পত্র জমা হয়ে গেছে। এসকল থলি সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.) তাঁর বিভিন্ন গ্রন্থে লিখেছেন যে, আমার কাছে শত্রুর গালি সম্বলিত এমন পত্রের বহু থলি রয়েছে। এতে শুধু গালিই নয় বরং ঘটনা হিসেবে বিভিন্ন মিথ্যা ঘটনা ও অবৈধ সম্পর্কের (মনগড়া কাহিনীর) কথা তাতে উল্লেখিত থাকত। সুতরাং, এমন কথা শুনে ভয় পাওয়া নির্বোধের কাজ।

এমন কথা আমাদের তাকওয়াকে পরিপূর্ণ করার জন্য হয়ে থাকে, এতে অসন্তুষ্টি বা রাগের কী আছে! পেয়ালাতে যা থাকে তা থেকে তাই উপচে পড়তে পারে। শত্রুর হৃদয়ে যেহেতু নোংরামি রয়েছে, তাই তা থেকে নোংরামিই প্রকাশ পায়। তাই, আমাদের যত বেশি সম্ভব নেকী এবং তাকওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত এবং নিজেদের চরিত্র পরিশুদ্ধ রাখা উচিত। কোন বৈঠকে, শত্রু যদি হাসিঠাট্টা করে তাহলে সেই বৈঠক থেকে উঠে চলে আস। এটিই খোদা তা'লার নির্দেশ। **(আল্ ফযল, ৯ মার্চ, ১৯৩৮, পৃ. ৭, সংখ্যা ৫৫, ২৬তম খণ্ড)**

অপর এক স্থানে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা নিদর্শন দেখানোর জন্য নবীদের সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রতিটি বিষয়কে আশিস এবং কল্যাণে সমৃদ্ধ করেন। মানুষের জন্য আবশ্যক হলো, সেসকল কল্যাণরাজি অর্জনের চেষ্টা করা। সুতরাং এসকল কল্যাণরাজিকে অস্বীকার করা যাবে না। এগুলো প্রমাণিত সত্য। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আচার ব্যবহারেও এর সত্যায়ন হয়। বদর পত্রিকায়ও ছাপা রয়েছে আর আমারও খুব ভালভাবে মনে আছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একবার দিল্লী গমন করেন এবং বিভিন্ন ওলীর কবরে দোয়া করতে যান।

খাজা বাকী বিল্লাহ্ সাহেব, হযরত কুতুব সাহেব, খাজা নিযামুদ্দিন আউলিয়া সাহেব, শাহ্ অলিউল্লাহ্ সাহেব, খাজা মীর দারদ্ সাহেব এবং নসীরুদ্দীন সাহেব চেরাগ প্রমুখের মাজারে তিনি দোয়া করেন। যদিও ডায়রি তখনও ছাপা হয় নি কিন্তু আমার যতটা মনে আছে, তখন তিনি যা কিছু বলেছেন তা হলো, দিল্লীবাসীদের হৃদয় মরে গেছে। আমরা এ সমস্ত মৃত ওলীদের কবরে গিয়ে তাদের জন্য, তাদের সন্তান-সন্ততিদের জন্য এবং স্বয়ং দিল্লীবাসীদের জন্য দোয়ার ইচ্ছা করলাম, যেন তাদের হৃদয়ে প্রেরণা সৃষ্টি হয় আর তারাও যেন এ সমস্ত লোকদের হিদায়াতের জন্য দোয়া করতে পারেন। ডায়রীতে শুধু এতটা ছেপেছে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমরা কবরে তাদের জন্যও দোয়া করেছি আর নিজেদের জন্যও দোয়া করেছি আর অন্য কিছু বিষয়ের জন্যও দোয়া করেছি। **(বদর পত্রিকা, ৮ নভেম্বর ১৯০৫)**

সুতরাং দেখুন, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) শুধু তাদের জন্য দোয়া করেন নি, যারা মনে করে যে, কবরে গিয়ে কেবল মৃত আত্মার জন্যই দোয়া করা উচিত। এই ডায়রী থেকে এই ধারণা খণ্ডন

হয়। কেননা, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আমরা তাদের জন্যও দোয়া করেছি আর নিজের জন্যও যে, আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের লক্ষ্য অর্জনে সফল করেন। এছাড়া অন্য কিছু বিষয়ের জন্যও দোয়া করেছেন। এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ডায়েরী, যা বদর পত্রিকায় ছাপা রয়েছে।

অনুরূপভাবে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) 'তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন'-এ লিখেন, আমার ইচ্ছা ছিল, এক মামলার কাজে গুরুদাসপুর যাওয়ার পূর্বে এই কিতাবের (তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন) লেখার কাজ শেষ করব, আর সেটিকে সাথে নিয়ে যাব। কিন্তু আমার কিডনীতে বা বৃক্কে মারাত্মক ব্যথা হয় আর আমি ভাবলাম যে, এ কাজ করা সম্ভব হবে না। তখন আমি আমার ঘরের লোকদের অর্থাৎ হযরত উম্মুল মু'মিনীনকে বললাম, আমি দোয়া করছি, আপনি 'আমীন' বলতে থাকুন। তখন, আমি সাহেবযাদা মৌলভী আব্দুল লতিফ শহীদের আত্মাকে সামনে রেখে দোয়া করেছি যে, হে আল্লাহ্! এ ব্যক্তি তোমার খাতিরে ত্যাগ স্বীকার করেছে। আমি তাঁর সম্মানের জন্য বই লিখতে চাই। তুমি নিজ অনুগ্রহে আমায় স্বাস্থ্য দাও। তিনি বলেন, সেই সত্ত্বার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ। সকাল ৬টা বাজার পূর্বেই আমি সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হয়ে উঠি আর সেদিনই অর্ধেকের মত বই লিখে ফেলি। **(তাযকেরাতুশ্ শাহাদাতাইন, রূহানী খাযায়েন, ২০তম খণ্ড, পৃ.৭২-৭৩)**

কাজেই দেখ! হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক মামলার জন্য যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পূর্বে তিনি সেই বই লেখার কাজও শেষ করতে চাচ্ছিলেন কিন্তু তিনি অসুস্থ হয়ে যান। তখন শহীদ মরহুমের আত্মাকে, যিনি তাঁর সেবকদের একজন ছিলেন, সামনে রেখে দোয়া করেন যে, হে আল্লাহ্! তার সেবা এবং কুরবানীকে দেখে আমি এই গ্রন্থ লেখার ইচ্ছা করেছি। তুমি নিজ অনুগ্রহে আমাকে সুস্থ কর। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর এই দোয়া গ্রহণ করেন। তিনি এই ঘটনার শিরোনামে এটি লিখেছেন যে, "মৌলভী আব্দুল করীম সাহেব মরহুম সংক্রান্ত একটি নতুন নিদর্শন।" পুণ্যবান এবং মুত্তাকীদের জীবনচরিত থেকেও এটি প্রমাণিত যে, মহানবী (সা.) স্বয়ং বেশ কয়েকবার এভাবে দোয়া করেছেন।

নিষিদ্ধ যা, তা হল মৃত সম্পর্কে এই ধারণা করা যে, তারা আমাদেরকে কিছু দিতে পারবে। এমন ধারণা সম্পূর্ণভাবে অবৈধ। ইসলাম এটিকে হারাম এবং নিষিদ্ধ আখ্যা দেয়। বাকি থাকল এই অংশ যে, এমন স্থানে গেলে যদি হৃদয় বিগলিত হয় বা মানুষ সে সকল প্রতিশ্রুতি স্মরণ করে যা আল্লাহ্ তা'লা নবীকে দিয়েছেন আর যদি দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্! এখন আমাদের সত্ত্বায় তুমি স্বয়ং এই সকল প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর।

এটি যে কেবল বৈধ তাই নয় বরং এটি এক আধ্যাত্মিক বাস্তবতা। মু'মিনের জন্য আবশ্যক হলো, এমন বরকতপূর্ণ স্থান থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা। দৃষ্টান্তস্বরূপ আমরা যখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মাজারে দোয়ার জন্য যাই, আমরা খোদা তা'লাকে সম্বোধন করে এটি বলতে পারি যে, হে আল্লাহ্! ইনিই সেই ব্যক্তি যার সাথে তোমার এই প্রতিশ্রুতি ছিল যে, আমি এর মাধ্যমে

ইসলামকে পুনর্জীবিত করব। তোমার প্রতিশ্রুতি ছিল, আমি তাঁর নামকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। অতএব তুমি তা পূর্ণ কর। **(আল্ ফযল, ১৪ মার্চ ১৯৪৪, পৃ. ৭, ৭ম খণ্ড, সংখ্যা ৬১)**

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন খোদার এই প্রতিশ্রুতির অংশ হয়ে তাঁর (আ.) মিশনের বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে নিজেদের দায়িত্বাবলী যথাযথভাবে পালন করতে পারি আর ইসলামের সত্যিকার চিত্র এবং বিজয় পৃথিবীকে দেখাতে পারি আর নিজেরাও যেন তা দেখার সৌভাগ্য পাই।

নামাযের পর একজনের গায়েবানা জানাযা পড়াব। এটি কাদিয়ানের দরবেশ মৌলভী মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেবের। ২০১৫ সালের ২২ জুলাই ৯৪ বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন। তার বংশে তিনি একমাত্র আহমদী ছিলেন। দীর্ঘদিন মাদ্রাসায়ে আহমদীয়ায় কুরআন এবং হাদীস পড়ানোর সৌভাগ্য হয়েছে তার। খুবই সাদাসিধে, বিনয়ী মানুষ ছিলেন আর দায়িত্ববোধের চেতনা নিয়ে কাজ করতেন। বড় নিষ্ঠাবান এবং বিশ্বস্ত একজন মানুষ ছিলেন। তিনি লাহোরের চুনিয়ার অধিবাসী ছিলেন যা আজকাল কসুর জেলার অন্তর্গত। বাল্যকালে তিনি নিজ গ্রামেই শিক্ষা অর্জন করেছেন।

১৯৩৯ সালে লাহোরের একটি আহলে হাদীস প্রতিষ্ঠান থেকে হাদীসের প্রারম্ভিক বই-পুস্তক পড়ার সুযোগ হয়েছে। সেখানে এক আহমদীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়, যার কাছ থেকে আহমদীয়াত সম্পর্কে জানতে পারেন। পরে সত্যের গবেষণার জন্য বেশ কয়েকবার কাদিয়ান আসা- যাওয়া করতে থাকেন। বই-পুস্তক পড়তে থাকেন।

অবশেষে ১৯৪৪ সনে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর হাতে তার বয়আতের সৌভাগ্য লাভ হয়। এরপর ধর্মীয় শিক্ষা অর্জনের জন্য কাদিয়ানে চলে আসেন এবং ১৯৪৭ সনের এপ্রিল মাসে মুবাল্লেগীন ক্লাসে ভর্তি হন। পড়ালেখা চলাকালে দেশ বিভাগ এবং কাদিয়ান থেকে হিজরতের ঘটনা ঘটে। কিন্তু তিনি সর্বাবস্থায় কাদিয়ানে বসবাস করাকে প্রাধান্য দেন এবং দরবেশের জীবন বেছে নেন। কাদিয়ানে আলেমদের ঘাটতি পূরণের জন্য মুবাল্লিগ ক্লাস থেকে কতককে বাছাই করে উচ্চ শিক্ষা দেয়া উচিত মর্মে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর নির্দেশের অধীনে ১৯৪৯ সনে তাকেও নির্বাচন করা হয়, যার মেয়াদ ছিল চার বছর।

শিক্ষা-কাল সমাপ্তির পর ১৯৫৫ সনের মে মাসে তাকে কাদিয়ানে মাদ্রাসা আহমদীয়ায় শিক্ষক হিসেবে নিযুক্তি দেয়া হয়। ১৯৫৮ সনের নভেম্বরে তিনি পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মৌলভী ফাযেল পাশ করেন। দীর্ঘদিন মাদ্রাসা আহমদীয়ায় শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। এরপর সিনিয়র শাহেদ গ্রেড নিয়ে তিনি অবসর গ্রহণ করেন কিন্তু এরপরও দীর্ঘদিন তিনি মাদ্রাসা আহমদীয়ায় দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। নামায এবং রোযার বিষয়ে গভীরভাবে সচেতন, কর্মশক্তিতে বলীয়ান

এক আলেম ছিলেন। শিষ্যদেরকে পিতার মত স্নেহ করতেন। বছরের পর বছর মাদ্রাসা আহমদীয়ায় ছাত্রদেরকে হাদীসের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত করতে থাকেন।

হাদীস-গ্রন্থের সুগভীর অধ্যয়ন ছিল তার আর বর্ণনাও এত আকর্ষণীয় ছিল যে, ছেলেদের হৃদয়ে পাঠ গেঁথে যেত। আহমদীয়াতের ইতিহাসের একাদশতম খণ্ডে কাদিয়ানের দরবেশদের যে তালিকা ছেপেছে, তাতে তার নম্বর হল **১৫৩**। বিভিন্ন সমস্যা সত্ত্বেও দরবেশীর দীর্ঘ যুগ তিনি পরম ধৈর্য্য এবং কৃতজ্ঞতার চেতনা নিয়ে কাটিয়েছেন। তিনি মুসী ছিলেন। ছেড়ে যাওয়া পরিবারে তিন কন্যা, এক সৎ পুত্র এবং নিজের এক পুত্র রেখে গেছেন, অর্থাৎ তার এক সৎ পুত্র ছিল।

তার পুত্র জনাব জামিল আহমদ নাসির সাহেব এডভোকেট, জামাতের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা এবং মুসীদের সম্পত্তির নাযেম তাশখিস। সৎ পুত্র জনাব বদর উদ্দিন মেহতাব সাহেব ফযলে ওমর প্রেসের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার হিসেবে কাজ করছেন।

তার কন্যা আয়েশা বেগম সাহেবা ডা. নাসের আহমদ সাহেব হাফেযাবাদির স্ত্রী। এখন নুসরাত উইমেনস কলেজের প্রিন্সিপাল হিসেবে কাজ করছেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন আর তার সন্তান-সন্ততিকে তার পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দান করুন।

(সূত্রঃ আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৪-২০ আগষ্ট ২০১৫, ২২তম খণ্ড, সংখ্যা ৩৩, পৃ. ৫-৯)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।